গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ, সংখ্যা ৩, নভেম্বর ২০২১, অগ্রহায়ন ১৪২৮

ফারজানা হক স্বর্ণা

ময়নাপাড়া বধ্যভূমির অজানা ইতিহাস

বাঙালি জাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ অধ্যায় হলো ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাংলার মাটিতে যে নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল তা ছিল বিংশ শতাব্দীর মধ্যে অন্যতম গণহত্যা। কবি সিকান্দার আবু জাফর তার রচিত কবিতায় লিখেছিলেন, 'গ্রামে গ্রামে আজ বধ্যভূমি'। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হচ্ছে, বইপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকাশিত বইপত্রে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাঁথা যতোটা আলোচিত হয়েছে সে তুলনায় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা সম্পর্কে তেমন বিশেষ বইপত্র প্রকাশিত হয় নি। বাংলাদেশের এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা, নির্যাতন চালায়নি। এসব গণহত্যা সংগঠিত হওয়ার পর শহিদদের গনকবর দেওয়া হতো। এসব গণকবরের অনেক গণকবর পড়ে আছে অবহেলায়। মুক্তিযুদ্ধের পর বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রীয় অবহেলার ধ্বংস হয়েছে ঠাকুরগাঁও জেলার গণকবর বধ্যভূমি ও শহিদ মুক্তিযুদ্ধাদের কবর ও স্মৃতিময় স্থান। ফলে যেখানে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে কবর দেয়া হয়েছিল, সেখানে আজ কোন স্মৃতি চিহ্ন নেই। এমনটি চলতে থাকলে এমন একদিন আসবে যেদিন কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবেনা এদেশে কখনও কোন গণহত্যা হয়েছিল। জাতীয় ইতিহাস রচনায় দেশ জাতি গঠনে গণহত্যার স্থান বধ্যভূমি গণকবর শহিদ ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবর চিহ্নিত করে তা রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি তা স্থায়ী অবকাঠামো করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ধরে রাখতে হবে। সঙ্গত কারণেই মনাপাড়া গণহত্যা, গণকবর নিয়ে আমার এ লেখা। এসব গণকবর চিহ্নিত হলে একটি অঞ্চলের সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগের বিবরণ উঠে আসবে। লিখিত হবে জনইতিহাস। মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ, পত্রিকা থেকে পাওয়া তথ্যের আলোকে ঠাকুরগাঁও জেলার শুখানপুকুরি ইউনিয়নের ময়নাপাড়া গণহত্যা ও গণকবর সম্পর্কে এ প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ব্রিটিশ উপনিবেশ শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল। কিন্তু বাঙালি মুসলমানেরা যে সম্মিলিত স্বপ্নকে সম্মুখে রেখে পাকিস্তানের জন্মকে স্বাগত জানিয়েছিল সে স্বপ্ন বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম থেকেই পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পকিস্তানকে নব্য উপনিবেশে পরিণত করে। শাসনতন্ত্রে দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে সাম্যনীতি গৃহীত হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাছাড়া পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে বাঙালিদের অংশগ্রহণের অধিকারকে অস্বীকার করে। যার ফলে বাঙালিরা বিভিন্ন কর্মসূচি ও আন্দোলনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসনের জন্য জোর দাবি জানাতে থাকে। এরূপ দাবির প্রেক্ষিতে সংঘটিত হয় ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪-এর নির্বাচন, '৬৬-এর ছয় দফা, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর সাধারণ নির্বাচন। অবশেষে '৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। জন্ম হয় এক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

আমাদের মাতৃভূমির জন্য সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস গভীর আত্মত্যাগের ইতিহাস। অবিশ্বাস্য সাহস ও বীরত্বের ইতিহাস। এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান লাভ করে নতুন এক দেশ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। এই যুদ্ধ শুধু একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্মই দেয়নি বরং শত বাধা অপসারণ করে একটি জাতির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে উন্মোচন করেছে বিশ্বের দরবারে। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে অনেক গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চলচ্চিত্র। গড়ে উঠেছে বিভিন্ন স্থাপনা ও ভাস্কর্য। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বাংলাদেশের শিল্পীদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, মুক্তিসত্তা ও আবেগের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে দেশপ্রেমের নব উদাহরণ।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাঁথা বেশি আলোচিত হয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু লিপিবদ্ধ হয়নি। বিশেষ করে উত্তরের জেলা বৃহত্তর দিনাজপুরের তৎকালীন মহকুমা ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ইতিহাসকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি। বর্তমান সময় পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের উপর প্রকাশিত গ্রন্থাবলিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে লেখকবৃন্দ তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব গণ্ডির ভেতরে দেখা ঘটনাবলি তাদের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে বৃহত্তর দিনাজপুরের যে অসংখ্য গণহত্যা হয়েছে সেসব গণহত্যা সম্পর্কে

অনেক তথ্য আজও অজানা। আজও চিহ্নিত হয়নি অনেক গণকরব, বধ্যভূমি। ফলে হারিয়ে গেছে অনেক গণকবর। অনেকগুলি হারিয়ে যাওয়ার পথে। জাতীয় ইতিহাসে এসব গণকবরগুলি খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি।

১৯৭১ সালে সারা দেশের মতো ঠাকুরগাঁও জেলায়ও পাকিস্তানি বাহিনী চালিয়েছে নির্মম গণহত্যা, লুট, ধর্ষণ। পাকিস্তানের এই নির্মম গণহত্যার স্বাক্ষর স্বরূপ ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিফলক তৈরি হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির পরেও চিহ্নিত হয়নি ঠাকুরগাঁও জেলার সুখানপুকুরী ইউনিয়নের ময়নাপাড়ার এই গণকবরটি। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার স্বাক্ষী হয়ে রয়েছে বিভিন্ন স্থানের বধ্যভূমি। ইতিহাসের এই বিভৎস হত্যাযজ্ঞের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন স্থানে। প্রচলিত তথ্য মতে এজেলায় ১৯টি বধ্যভূমির খোঁজ পাওয়া গেছে। ২/৪ জনের কবর এই হিসাবে ধরা হয়নি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও জানা যাচ্ছে নতুন বধ্যভূমির কথা, গণহত্যার এক অজানা কাহিনি। এমনি এক বধ্যভূমি হলো ময়নাপাড়া বধ্যভূমি।

ঠাকুরগাঁও শহর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ১৮নং সুখানপুকুরী ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম ময়না পাড়া। এপাড়ায় রয়েছে একটি বধ্যভূমি। যে বধ্যভূমির স্বীকৃতি মেলেনি স্বাধীনতার ৫০ বছরেও, তৈরি হয়নি কোন বেদী বা স্মৃতি চিহ্ন। স্বাধীনতার ৫০ বছরে এমনি এক গণহত্যার অজানা কাহিনি ও বধ্যভূমি নিয়ে আমার এ লেখা।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা হলো সত্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। অন্য কথায় গবেষণা হলো পুনঃঅনুসন্ধান। বলা হয়ে থাকে যে সম্পূর্ণ অজানাকে জানা নয়, বরং যা সম্পর্কে অল্প বা অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে তাকে গভীরভাবে জানা ও স্পষ্ট করার মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জন করাই হলো গবেষণা। এই গবেষণা সম্পাদনে বিশ্লেষণ তথ্য, ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও সমকালীন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ সাক্ষাৎকার কিংবা মতামত প্রভৃতি হতে অত্র গবেষণার উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। উপযুক্ত পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যকে ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি মোতাবেক বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁও জেলা নামকরণের ইতিহাস

বাংলাদেশের ম্যাপে উত্তরে অবস্থিত হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত উত্তরের প্রত্যন্ত জনপদ ঠাকুরগাঁও। অবারিত সবুজের শষ্যক্ষেত জনপদটিতে ছড়িয়ে রেখেছে স্নিগ্ধতার আবহ। ঠাকুরগাঁও এই জনপদটি সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলার মূল ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হলেও এখানকার প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন ধরনের, মানুষও স্বতন্ত্র স্বভাবের ঠাকুরগাঁও জেলার নামকরণের ইতিহাসেও রয়েছে ভিন্নতা। অধ্যয়ন ও গবেষণার অভাবে ঠাকুরগাঁওয়ের ইতিহাস আজো রয়েছে অন্ধকারে নিমজ্জিত। তবে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অনুসন্ধানের কাজ হয়েছে বলেই ঠাকুরগাঁওয়ের অতীতের বিক্ষিপ্ত ইতিহাসের কথা শোনা যায় মানুষের মুখে মুখে।

১৮ হাজার ৯ কিমি: আয়তনের এ জেলা ছিল প্রাচীন পুন্ড্রবর্ধন জনপদের অংশ। এই জেলার উত্তরে পঞ্চগড়, পূর্বে পঞ্চগড় ও দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণ ও পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অবস্থিত। জেলারূপে নতুন হলেও জনপদ হিসেবে ঠাকুরগাঁওয়ের রয়েছে এক সুপ্রাচীন ইতিহাস।

ঠাকুরগাঁও নামটি শুনলেই মনে হবে এটি একটি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। অসংখ্য ঠাকুর দেবতার সমন্বয়ে ভরপুর এ জেলা। হিমালয়ের কোল ঘেঁষে অবস্থিত এ জেলা সভ্যতার পথে হাঁটতে শুরু করেছে অনেক আগেই। তাই প্রাচীন সভ্যতার কোন নিদর্শন খুঁজে পেতে চাইলে তার সন্ধান করতে হবে ঠাকুরগাঁও সংলগ্ন এলাকাতেই। কারণ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কার হয়েছে ঠাকুরগাঁওয়ের কাছাকাছি নেপালের রাজ্য দরবার থেকে। আবার দেখা যায়, ঠাকুরগাঁও সংলগ্ন এলাকার মানুষের মুখের ভাষার সাথে চর্যাপদের ভাষার যথেষ্ট মিল রয়েছে। ঠাকুরগাঁও সন্নিহিত এলাকাকে চর্যাপদ রচনার এলাকা বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতিহাস সমৃদ্ধ এই জনপদটিতে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন সভ্যতার বহু মূলবান ইতিহাস। গবেষণা কাজের অভাবে বাংলার প্রাচীনতম জনপদ পুন্ড্র বর্ধনের বরেন্দ্রর কেন্দ্রস্থল ঠাকুরগাঁওয়ের ইতিহাস আজো অনাবিষ্কৃত আছে। আর্যরা এদেশের আগমনের বহু আগে থেকেই এই অঞ্চলসহ সমগ্র দিনাজপুর জেলার ছিল সভ্য মানুষের বসবাস। তার প্রমাণ হলো অবিভক্ত দিনাজপুর বানগড়ে বা কোটিবর্ষে প্রস্তর যুগের বহু নিদর্শন প্রাপ্তি। সেখানে যদি প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া যায় তবে স্বাভাবিক ভাবেই ঠাকুরগাঁওয়েও এ ধরনের প্রত্ন বস্তু পাওয়ার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা আছে। এখনও ঠাকুরগাঁওয়ের

বিভিন্ন অঞ্চলের পুকুর দিঘি খননের সময় অসংখ্য প্রাচীন মূর্তি পাওয়া যায়। ১৯৮৪ সালে ঠাকুরগাঁও সদর থানার রাজাগাঁও গ্রাম থেকে কিছু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ২১ টি মুদ্রা স্থানীয় ট্রেজারিতে জমা আছে। উল্লেখ্য যে পরবর্তীতে এ মুদ্রাগুলো সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় নি। খ্রিষ্টিয় চতুর্থ শতকে পুণ্ড্ররাজ তথা বাংলাদেশ গুপ্তদের অধিকারে আসে। সে সময়ে দিনাজপুরের কোটিবর্ষ ছিল পুন্ড্ররাজ্য তথা বাংলাদেশের একটি বিষয়ের সদর দপ্তর। আর একটি বিষয়ে কেন্দ্রস্থল ছিল পঞ্চনগরী। এই পঞ্চনগরীর বর্তমান অবস্থান দিনাজপুর জেলার চরকাই বিরামপুর, চন্ডীপুর ও গড় পিঙ্গলাই এলাকায়। গুপ্ত আমলের বেশ কিছু তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমান দিনাজপুর জেলা থেকে। ঐতিহাসিক আঃ কাঃ মোঃ যাকারিয়া দিনাজপুর জেলায় গুপ্ত আমলের প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন সমৃদ্ধ এলাকার নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল থানার নেকমরদের নামও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে অনুমান করা যায় বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলায় গুপ্ত আমলের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে।

হিমালয়ের কোল ঘেঁষে অবস্থিত টাঙ্গন নদীর তীরবর্তী একটি গ্রামে রাজা গোবিন্দ নারায়ণ ঠাকুর তার প্রথম আস্তানা গড়ে তোলেন। ধর্ম চর্চার জন্য তৈরি করেন মন্দির ও বিভিন্ন ধর্মশালা। ফলে পুরোহিত ঠাকুর সন্ন্যাসিতে ভরে উঠে গ্রামটি। এরপর ধীরে ধীরে ঠাকুরদের গ্রাম থেকে ঠাকুরগাঁও নামান্তরিত হয় বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এর সমর্থনে ইতিহাস হতে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[১]

মানচিত্রে ঠাকুরগাঁও নিশ্চিন্তপুর নামে দুটি আলাদা জায়গা করা আছে। টাঙ্গন নদী পূর্ব প্রান্তে দেখানো হয়েছে নিশ্চিন্তপুর এবং এর কিছুটা উত্তর পশ্চিমে টাঙ্গন নদীর পশ্চিম প্রান্তে দেখানো হয়েছে ঠাকুরগাঁও। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে টাঙ্গন নদীর পূর্ব প্রান্তে নিশ্চিন্তপুরকেই পরবর্তীতে ঠাকুরগাঁও নাম দিয়ে সদরের নামকরণ করা হয়।[২] আর এর মাধ্যমেই নিশ্চিন্তপুর রুপান্তরীত হয় ঠাকুরগাঁওয়ে। প্রথমে সমগ্র মহকুমা পরিচিতি হয় ঠাকুরগাঁও নামে এবং পরে এরই ধারাবাহিকতায় ঠাকুরগাঁও জেলা হিসেবে পরিচিত লাভ করে। ১৭৯৩ সালে ঠাকুর গ্রাম অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রচলিত অন্য ইতিহাস থেকে জানা যায়, জেলা সদর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আকচা ইউনিয়নে সতিশ ও নারায়ণ চক্রবর্তী নামে দুই জমিদার।[৩] সদর তাদের বসত বাড়ি ঠাকুরবাড়ি নামে পরিচিত

ছিল। ধারণা করা হয় যে, ঠাকুরবাড়ি থেকে ঠাকুরগাঁও নামের উৎপত্তি। চক্রবর্তী বাবু অনুরোধে জলপাইগুড়ির জমিদার এখানে একটি থানা স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে রাজি করালে ১৮০০ খ্রি: গোড়ার দিকে এখানে একটি ঠাকুরগাঁও নামে থানা স্থাপন করা হয়। পরে টাঙ্গন নদী পূর্বতীরে ঠাকুরগাঁও থানা স্থানান্তরিত হয়।[৪] প্রচলিত ইতিহাস মতে, ঠাকুর অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্যের কারণে স্থানটির নাম ঠাকুরগাঁও হয়েছে।

১৮০০ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে টাঙ্গন, শুক, কুলিক, পাথরাজ ও ঢেপা বিধৌত এই জনপদের একটি ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে বর্তমান পৌরসভার কাছাকাছি কোন একটি স্থানে থানা স্থাপন করা হয়। তাদের নামানুসারে থানাটির নাম হয় ঠাকুরগাঁও থানা। ১৮৬০ সালের প্রথম দিকে এটি মহকুমা হিসেবে ঘোষিত হয়।[৫] এর অধীনে সে সময় ৬টি থানা ছিল। এগুলো হলো–ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গি, পীরগঞ্জ, রানিশংকৈল, হরিপুর ও আটোয়ারি। ১৯৪৭ সালে এই ৬টি থানা ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার ৩টি থানা ও কোচবিহারের ১টি থানা, মোট ১০টি থানা নিয়ে মহকুমা হিসেবে ঠাকুরগাঁও নতুনভাবে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু ১৯৮১ সালে আটোয়ারি, পঞ্চগড়, বোদা, দেবিগঞ্জ ও তেঁতুলিয়া নিয়ে পঞ্চগড় আলাদা মহকুমা হলে ঠাকুরগাঁও ৫টি থানায় সংকুচিত হয়। থানাগুলি হলো- ঠাকুরগাঁও সদর,বালিয়াডাঙ্গি, পীরগঞ্জ, রানিশংকৈল, হরিপুর। ১৯৮৪ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও জেলা হিসেবে যাত্রা শুরু করেন।[৬] ঠাকুরগাঁওয়ের নাম বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত হয় জেলা রূপে। জনপদ হিসেবে নতুন হলেও ঠাকুরগাঁওয়ের রয়েছে এক সুপ্রাচীন ইতিহাস। প্রশাসনিক ঠাকুরগাঁও জেলার ৫টি থানা বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তে ৮৮.৬″ ও ৮৮.৩৯″ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এবং ২৫.৪৬″ ও ২৬.২১″ উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত ঠাকুরগাঁও জেলা মোট আয়তন ১৮০৯.৫২ কিলোমিটার।[৭] ৫টি থানা মিলে মোট ইউনিয়ন ৫১টি। বর্তমান লোকসংখ্যা ১২,৯৫,৯২২ জন এর মধ্যে পুরুষ ৬,৬১,৪৩৯ ও মহিলা ৬,৩৪,৪৮৩ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৬২ জন মানুষ বাস করে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১.৪৮%।

ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রায় সাড়ে ১২ হাজার আদিবাসী আছে। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোচ, পলিয়া, রাজ বংশী।[৮] এছাড়া দীর্ঘ শিবাকার ও প্রশস্ত নাশা বৈশিষ্ট্যসহ আদি অস্ট্রেলিয় এবং মোঙ্গলীয় রক্তের মিশ্রণ জাত আরো কয়েকটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর এ জেলায় পরিদৃষ্ট হয়। যেমন: মালো, মাহতো, ভুঁইয়া, হাড়ি, হো, কুকামার, গাংঘু প্রভৃতি।[৯]

মুক্তিযুদ্ধে ঠাকুরগাঁও জেলার গণহত্যা ও গণকবর

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ঠাকুরগাঁওবাসীর ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ অপারেশন 'সার্চলাইট' নামক গণহত্যা শুরু হওয়ার পরে ঢাকার পরে সারা দেশে সামরিক বাহিনী ছড়িয়ে পড়ে।[১০] পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি বাংলাদেশের উত্তরের জেলা (তৎকালীন দিনাজপুর জেলার একটি মহকুমা) ঠাকুরগাঁও। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর সারা দেশের অন্যান্য জেলার মতো ঠাকুরগাঁওয়ের জনগণও মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। প্রায় ২০/২১ দিন মুক্ত থাকার পর ১৫ এপ্রিল ঠাকুরগাঁও শহরের পতন ঘটে।[১১] সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকিস্তানি সেনারা ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভূষির বন্দর দিয়ে দশ মাইল হয়ে ভাঁতগাঁও পুল অতিক্রম করে বেলা ১১ টায় ঠাকুরগাঁও শহরে প্রবেশ করে।[১২] শক্ত প্রতিরোধ থাকার কারণে ২৫ মার্চের কালরাত্রির পর দীর্ঘ ২০/২১ দিন খানসেনারা ঠাকুরগাঁওয়ের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। পরবর্তীতে অস্ত্র ও গোলাবারুদের অভাবে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ডিফেন্স তুলে নিতে বাধ্য হলে খানসেনারা বিনা বাঁধায় ঠাকুরগাঁওয়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বীরগঞ্জ থেকে ঠাকুরগাঁও আসার সময় রাস্তার উভয় পাশের দোকান পাট, ঘর বাড়িতে তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। ঠাকুরগাঁও শহরে প্রবেশের পথে কালিবাড়িতে বেশ কয়েকটি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়।

শহরে প্রবেশ করে খানসেনারা প্রথমেই টাঙ্গন নদীর তীরবর্তী মহকুমা প্রশাসকের বাংলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা এসময় ঠাকুরগাঁও শহরে বেশ কিছু জায়গা যেমন : জাঠিভাঙ্গা, আকচা, জগন্নাথপুর, বরুনাগাঁও, ফাঁরাবাড়ি, ভুল্লিসহ বেশ কিছু জায়গায় ব্যাপক গণহত্যা ও নির্যাতন চালায়। ১৭ এপ্রিল খানসেনারা শহর ছেড়ে নিকটস্থ থানা সদরগুলোর দিকে অগ্রসর হয়। ঠাকুরগাঁওয়ে সে সময় বেশ কিছু অবাঙালি পরিবার ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা বাঙালিদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করলেও খান সেনাদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতো। তারা সাইকেল যোগে অথবা পায়ে হেঁটে সৈয়দপুরে গিয়ে স্বগোত্রীও অবাঙ্গালিদের সাথে নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীদের কাছে ঠাকুরগাঁওয়ের সমস্ত খবরাখবর পাচার করতো। পরবর্তীতে অধিকাংশ অবাঙালি বিহারীরা খানসেনাদের সাথে আগমন করে এবং বিভিন্ন স্থানে হত্যা ও লুটপাটে অংশ নেয়। কখনো বা এরাই এককভাবে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। এরা খানসেনাদের বিভিন্ন স্থানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত। এদের তত্বাবধানে ঠাকুরগাঁও জেলায় বেশ কিছু গণহত্যা সংগঠিত হয়।

ময়নাপাড়া গণহত্যা ও গণকবর

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা চালানো হয়। এই গণহত্যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত চলে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে শহিদদের একসাথে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হতো যা গণকবর নামে পরিচিত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর এই নির্মম গণহত্যা থেকে রক্ষা পায়নি উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁও। ১৯৭১ সালে সারা দেশের মতো ঠাকুরগাঁও জেলায়ও পাকিস্তানি বাহিনী চালিয়েছে নির্মম গণহত্যা, লুট, ধর্ষণ। পাকিস্তানের এই নির্মম গণহত্যার স্বাক্ষর স্বরূপ ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানে স্মৃতি ফলক তৈরি হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির প্রাককালে আজও চিহ্নিত হয়নি ঠাকুরগাঁও জেলার সুখানপুকুরী ইউনিয়নের ময়নাপাড়ার এই গণকবরটি। মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার স্বাক্ষী হয়ে রয়েছে বিভিন্ন স্থানের বধ্যভূমি। ইতিহাসের এই বিভৎস হত্যাযজ্ঞর চিহ্ন ছড়িয়ে আছে ঠাকুরগাঁও জেলার বিভিন্ন স্থানে। প্রচলিত তথ্য মতে এ জেলায় ১৯টি বধ্যভূমির খোঁজ পাওয়া গেছে। ২/৪ জনের কবর এই হিসাবে ধরা হয়নি। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও জানা যাচ্ছে নতুন বধ্যভূমির কথা, গণহত্যার এক অজানা কাহিনি। এমনি এক বধ্যভূমি হলো ময়নাপাড়া বধ্যভূমি।[১৩]

ঠাকুরগাঁও শহর থেকে প্রায় ১৬ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ১৮ নং সুখানপুকুরী ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম ময়না পাড়া। এপাড়ায় রয়েছে একটি বধ্যভূমি। যে বধ্যভূমির স্বীকৃতি মেলেনি স্বাধীনতার ৫০ বছরেও, তৈরি হয়নি কোন বেদী বা স্মৃতি চিহ্ন। স্বাধীনতার ৫০ বছরে এমনি এক গণহত্যার অজানা কাহিনি ও বধ্যভূমি নিয়ে আমার এ লেখা।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে সুখানপুকুরী ইউনিয়নের ময়নাপাড়ায় ঘটে একটি নির্মম হত্যাযজ্ঞ গণহত্যা। এই পৈশাটিক হত্যাকাণ্ডের নির্মমতা মানুষের ছিল কল্পনাতীত, স্থানীয় গ্রামবাসীর সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে হানাদার বাহিনীর এই নির্মম হত্যাযজ্ঞের নৃসংশতা স্থানীয় অধিবাসী শ্রী নীলেন্দ্র নাথ বর্মনের বর্ণনায় জানা যায়, সেই দিন ময়নাপাড়া হত্যাযজ্ঞ করা হয়েছিল রাইফেল বন্দুক দিয়ে গুলি করে নয় বা বেয়নেট দিয়ে নয়, বাঁশের তীর ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছিল ২৫ জন নারী, পুরুষ ও শিশুকে। এই ২৫ জনের মধ্যে একই পরিবারের ছিলেন ১২ জন।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শুখানপুকুরী ইউনিয়নের একেবারেই পূর্বদিকে অবস্থিত এই ময়নাপাড়া গ্রাম। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে কোন এক দিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমন চালায় ময়নাপাড়া গ্রামে। এসময় আশেপাশে গ্রাম থেকে অনেকে সীমান্তবর্তী এলাকার দিকে যাচ্ছিল। সেসময় পাকিস্তানি সৈন্যদের ইশারায় স্থানীয় কিছু রাজাকাররা তাদের ধাওয়া করে ময়নাপাড়ার একটি খালের পাশে এনে ২৫ জন গ্রামবাসীকে জড়ো করে। পরে তাদের বাঁশের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। এদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল অর্ধমৃত। পাকিস্তানি নরপুশুরা তাদের মৃত আর অর্ধমৃত অবস্থায় মাটি চাপা দেয়। লুটপাট চালানো হয় তাদের ঘর বাড়িতে, অনেক বাড়িতে দেওয়া হয় আগুন। পাকিস্তানি দোসরদের নির্মমতার বর্ণনা দিতে গিয়ে এখনও শিউরে উঠে স্থানীয় গ্রামবাসী। শহিদ পরিবারের সন্তান নীলেন্দ্র রায় বর্মন স্থানীয় এক মেঘা নামে এ ব্যক্তির কাছে শোনা ঘটনার বর্ণনা দেন। তার বর্ণনায় ফুটে উঠে সেদিনের নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। পাকিস্তানি সেনারা যখন বাঁশ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মানুষ হত্যা করছিল, তখন ৮ বছরের বালক উপেন্দ্র নাথ রক্তাক্ত অবস্থায় পাকিস্তানিদের কাছে পানি চাইলে পাকিস্তানি সৈন্য তাকে আছাড় মারলে তার পেটের নাড়ি ভুড়ি বের হয়ে যায়। সৈন্যরা ২৫টি লাশ একটি গর্তে ফেলে প্রথমে একজাতীয় কাঁটা গাছ ফেলে ও পরে মাটি চাপা দেয়। শহীদ পরিবারের একজন সদস্য হলেন নলিন্দ্রনাথ বর্মন। ১৯৭১ সালে তার বয়স ছিল ১১/১২ বছর। তিনি পরবর্তীতে স্থানীয় অধিবাসী মেঘার কাছে ঘটনার বর্ণনায় শুনেছিলেন এই ২৫টি লাশের উপরে যখন মাটি চাপা দেওয়া হয় তখন ও কারও কারও দেহে প্রাণ ছিল। এই মেঘা ঝোপের আড়ালে থেকে সম্পূর্ণ ঘটনা লক্ষ্য করেন। সেইদিন ময়নাপাড়ায় যাদের হত্যা করা হয়েছিল তারা হলো:

নাম	**বয়স**	**পেশা**
শ্রী ভবেশ্বর বর্মন	৫৫	কৃষি
শ্রী রমানাথ বর্মন	৪৫	কৃষি
শ্রী ধনহরি বর্মন	১৪/১৫	৫ম শ্রেণি
শ্রী উপেন্দ্রনার্থ বর্মন	৮	১ম শ্রেণি
শ্রীমতি সর্মিলা	৩০/৩২	গৃহিনী
শ্রীমতি লতিকা বর্মন	৫	গৃহিনী
শ্রী সুভাষ চন্দ্র বর্মন	৬	
শ্রীহরী ধুপস্মরী র্বমন	৪২	কৃষি
শ্রীমতি সুরুবালা বর্মন	১৩	৩য় শ্রেণি
শ্রমতি সবোবালা বর্মন	১৭	৪র্থ ”
শ্রীমতি কৌশলা বর্মন	১৭	”
যতীন্দ্রনাথ বর্মন	৬০	কৃষি

অন্যান্য শহিদদের তালিকা:

শ্রীমতি পুশো বেওয়া	৫৫	গৃহিনী
শ্রীমতি পঞ্চমী বর্মন	১৮	”
শ্রী নকমতি বর্মন	৫০	কৃষি
শ্রী ভটুরি বর্মন	৩০	”
শ্রী দ্বীগেন্দ্রনাথ বর্মন	৫৫	”
শ্রী পূণ্যচন্দ্র বর্মন	৪০	”
অজিত	৩৫	”
অশোক	২০	”
নতিকা	৫ বছর	

অনুসন্ধানে এই ২২ জন শহিদের নাম পাওয়া যায়, বাকি ৩জন শহিদের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি।

এই গ্রামের কিছু লোক ছাড়া তেমন কেউই জানে না এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা। শহিদের স্মৃতি রক্ষার্থে এ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি কোন সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ। ১২ জন স্বজনহারা শহিদ পরিারের দুজন সদস্য এখনও বেঁচে আছেন তারা হলেন শ্রী নীলেন্দ্র নাথ বর্মন, নলিন্দ্র নাথ বর্মন। তাদের বাবা ছিলেন শহিদ রমানাথ বর্মন, মা ছিলেন বেলেনশরী বর্মন। শ্রী নীলেন্দ্রনার্থ বর্মন পূর্বে ছিলেন ইউপি সদস্য। বর্তমানে তিনি ও তার ভাই দুজনই কৃষি কাজ করেন। দুজনেরই আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। এমনকি তাদের বাসায় নেই একটি টিউবওয়েল, তাদের খাবার পানি আনতে হয় গ্রামের স্কুলের টিউবওয়েল থেকে। ১২ জন স্বজনহারা এই দুই ভাই কখনো পায়নি বয়স্ক ভাতা ও মুক্তিযোদ্ধা ভাতা। তাতেও যেন তাদের কোন দুঃখ নেই। তাদের শেষ বয়সে করুণ আকুতি তাদের এই বধ্যভূমিতে যেন একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়। নীলেন্দ্রনাথ বর্মন বলেন এই

গণকবরের জায়গাটি তাদের নিজস্ব, তাই আজও তারা জায়গাটিতে কৃষি কাজ করে না। জায়গাটি বর্তমানে গাছপালায় পরিপূর্ণ দুই ভাই নীলেন্দ্র বর্মন ও নলিন্দ্র নাথ বর্মনের সাথে সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় তাদের চোখের পানি বার বার মনে করে দিচ্ছিল জাতি হিসেবে আমরা কতটা অভাগা। আমরা আমাদের সূর্য সন্তানদের গণকবরের জায়গাটিতে স্বাধীনতার ৫০ বছরেও কোন স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তুলতে পারিনি, পারিনি তাদের জীবিত স্বজনদের যথার্থ সম্মান দিতে। এই শহিদ পরিবারের দাবি একটাই স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে ময়নাপাড়া গণকবরে একটা স্মৃতিস্তম্ভ চায়।

উপসংহার

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা অর্জনে যেসব বীরমুক্তিযোদ্ধা ও নিরীহ বাঙালিরা প্রাণ দিয়েছে, যাদের অনেককেই একসাথে দেওয়া হয়েছে গণকবর। সেই সব গণকবরগুলোতে কিছু কিছু জায়গায় স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হলেও অধিকাংশ গণকবরগুলো আজও পড়ে আছে অরক্ষিত অবস্থায়। পরিতাপের বিষয় এই যে এই গণকবরগুলো সংরক্ষণের জন্য আজও নেওয়া হয়নি কোন উদ্যোগ। সরকারিভাবে সহায়তার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোকেও এগিয়ে আসা উচিত এসব বধ্যভূমি, গণকবরগুলো সংরক্ষণের জন্য। নয়তো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মহান মুক্তিযুদ্ধের এসব গণহত্যা, গণকবরগুলো শুধু কল্পকাহিনি হিসেবেই বিবেচিত হবে।

তথ্য নির্দেশ

১. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, 'নামকরণের উৎসে ঠাকুরগাঁও', *সেনুয়া* (৬ষ্ঠ সংখ্যা), ২০১৪, পৃ. ১৫-১৬।

২. মনতোষ কুমার দে, 'ঠাকুরগাঁয়ের ইতিকথা: অন্ধকারে বিচ্ছুরিত হীরকের দ্যুতি', গাজী মিজানুর রহমান, মো: আতাউর রহমান সম্পাদিত *ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ২০০৫, পৃ. ৫২।

৩. উপজেলা পরিচিতি, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা পরিষদের তথ্য, *পরিকল্পনা ও বাজেট বই*, সদর উপজেলা পরিষদ ঠাকুরগাঁও, পৃ. ১০।

৪. মো: আব্দুল লতিফ, *মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস: ঠাকুরগাঁও জেলা*, তাম্রলিপি প্রকাশন, ২০১৭, পৃ. ১৭।

৫. *সাপ্তাহিক পঞ্চবার্তা*, ৯ নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ৩।

৬. *বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬,পৃ. ৪।

৭. মো: আতাউর রহমান, *ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, পৃ. ৩৩।

৮. ড. নাজমুল হক, 'জেলার জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়', গাজী মিজানুর রহমান, মো: আতাউর রহমান সম্পাদিত *ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা: ইতিহাস ও ঐতিহ্য*, ২০০৫, পৃ. ৭১।

৯. অজয় রায়, 'বাঙালির জন্ম—একটি নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান', *সুন্দরম* (সম্পাদক : মুস্তাফা নূরউল ইসলাম), শরৎ সংখ্যা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ভাদ্র-কার্তিক '৯৩, আগস্ট-অক্টোবর '৮৬, ঢাকা, পৃ. ৪৬

১০. মো: আব্দুস সালাম, *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ: ঠাকুরগাঁও জেলা*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, খুলনা, ২০১৯ পৃ. ২১।

১১. 'সশস্ত্র প্রতিরোধের ঠাকুরগাঁ-দিনাজপুর, সাক্ষাৎকার-সুবেদার মেজর কাজিম উদ্দিন', হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: অষ্টম খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয় (মুদ্রণ ২০১১),পৃ. ২৯৭।

১২. মোহাম্মদ এমদাদুল হক, *মুক্তিযুদ্ধে ঠাকুরগাঁও*, জনপ্রিয় প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৬, পৃ. ১৪১।

১৩. *সাপ্তাহিক সংগ্রামী বাংলা*, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৭; পৃ. ১।